একক ৩৮ ❐ বাংলায় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো—আদিযুগ

গঠন ঃ

৩৮.০ উদ্দেশ্য
৩৮.১ প্রস্তাবনা
৩৮.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)
৩৮.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)
৩৮.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার
    ৩৮.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংস বিচার বিভাগীয় সংস্কার
    ৩৮.৪.২ কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার
৩৮.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি
    ৩৮.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর
    ৩৮.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি
    ৩৮.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট
    ৩৮.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব
৩৮.৬ সারাংশ
৩৮.৭ অনুশীলনী
৩৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার কথা।
- ওয়ানের বেস্টিং ও কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার।
- বাংলার ভূমিব্যবস্থায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট ও পরিণতি।

৩৮.১ প্রস্তাবনা

১৭৬৫ সালে ইংলেজ কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক

পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিকেরা দ্বৈত শাসনব্যবস্থা (Dual system of administration) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে দুজন শাসকের অধীনস্থ হয়। বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা সমেত যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রশাসন রইল ইংরেজ কোম্পানির হাতে। অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নিজামতের দায়িত্ব সমেত আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রইল নবাব নজম উদ্দৌল্লার হাতে। কিন্তু দেওয়ানির দায়িত্ব না থাকার ফলে নবাবের রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই বলা হয়েছে এলাহাবাদ চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি পেল দায়িত্বহীন অধিকার এবং বাংলার নবাব পেলেন অধিকারহীন দায়িত্ব। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যা বাংলার ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' (১১৭৬ বঙ্গাব্দে হয়েছিল বলে) নামে পরিচিত বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন বাংলার অবস্থার পরিবর্তন জরুরী। তাছাড়া বাংলায় ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি, ্সৎ উপায়ে সম্পদ আহরণ, উদধত আচরণ ও অত্যাচার ইংল্যান্ডে উত্তপ্ত বিতর্কের সূচনা করেছিল। তখন থেকেই বাংলাদেশে একটি ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। বাংলাদেশে কোম্পানির কার্যকলাপে ব্রিটিশ সরকার কতটা হস্তক্ষেপ করবে তা নিয়েও বিতর্ক চলে। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানি এবং ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশে একটি সুবিন্যস্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াস চালানো হয় ; যা আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি বণিক সংস্থা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ছিল তার বাণিজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির তিনটি প্রধান ঘাঁটি ছিল কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজ। এই ঘাঁটিগুলো স্বতন্ত্র তিনটি কাউন্সিল বা পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হত। এই কাউন্সিলগুলি লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী বা কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে কাজ করত। কোম্পানির মালিক ও অংশীদারদের নিয়ে এই কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ গঠিত হত। প্রতিটি ভারতীয় ঘাঁটিতেই বণিকদের ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যাস থাকত। কেবলমাত্র সফল বণিকরাই কাউন্সিলের সদস্য হতেন। এই সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে কাউন্সিলের সভাপতি করা হত। এই সভাপতি হতেন সংশ্লিষ্ট ঘাঁটির গভর্ণর। কাউন্সিলগুলি তাঁদের নিজস্ব ঘাঁটির রাজনৈতিক ও বাণিজ্যক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করত।

কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন ছিল সামান্য। কিন্তু তাঁরা ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে নিজেদের আয় বাড়াতে পারতেন। তবে ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। এক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত বেসরকারি বাণিজ্য চালানোর সুযোগ পেতেন না। পলাশীর পর থেকেই বাংলাদেশের কোম্পানি কর্মচারীদের সম্পদ বিপুল হাতে বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদশালী ইংরেজ বণিকের দল আঠেরো শতকের ইংল্যান্ডে একটি প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। ১৭৬৭ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই গোষ্ঠীর প্রভআব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুর্নীতিগ্রস্ত এই বণিকগোষ্ঠী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রভাবশালী হয়ে ওঠার ফলে ইংল্যান্ডের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদেরা অসন্তুষ্ঠ হয়েছিলেন।

এইসব ইংরেজ বণিকের দল প্রায়ই অসৎ উপায় অবলম্বন করে কোম্পানির শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে তুলেছিলেন। কিন্তু কোম্পানি এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবসঅথা নিতে পারেনি, কারণ কোম্পানির ভেতর থেকেই বাধা এসেছিল। অসদুপায়ে বিপুল সম্পদ অর্জনকারী কর্মচারীরা সকলেই ছিলেন কোম্পানির কর্তাব্যক্দিরে আত্মীয় অথবা ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। তাছাড়া কোম্পানির মালিক ও অংশীদারেরাও এই বিপুল সম্পদে ভাগ বসাতে আগ্রহী ছিলেন। ১৭৬৬ সালে কোম্পানির অংশীদারদের লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ডের হার করা হয় ১০ শতাংশ। ১৭৬৭ সালে ডিভিন্ডের হাত আরও বাড়িয়ে করা হয় ১২$^{১}/_{২}$ শতাংশ। ফলে কোম্পানি এক মারাত্মক আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়।

৩৮.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩)

১৭৭২ সালে কোম্পানির কার্যকলাপে সরকারি হস্তক্ষেপের যে তৎপরতা চলেছিল, দতারই পরিণতি ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট। কোম্পানির কাছ থেকে ব্রিটিশরাজ্যের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই আইন। এই আইনের কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, কোম্পানির অংশীদার ও পরিচালকদের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করা। দ্বিতীয়ত, কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়ত, বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার সম্পর্ক কি হবে তা নির্ধারণ করা। এই আইন অনুযায়ী ৫০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডারদের ভোটদানের ক্ষমতা নাকচ করা হয়। কমপক্ষে ১০০০ পাউন্ড শেয়ারহোল্ডাররা ১টি ভোট দেবার অধিকার পান। ৩,০০০, ৬,০০০ ও ১০,০০০ পাউন্ডের শেয়ার হোল্ডারদের যথখাক্রমে ২, ৩ ও ৪টি ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। অর্থায কোম্পানিতে বিত্তবানদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই আইনে বলা হয় যে, কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস্ ব্রিটিশ সরকারের কাছে কোম্পানির শাসন ও অর্থনীতি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির উপর কর্তৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। বেম্ব ও মাদ্রাজ কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল নামে নতুন একটি পদ সৃষ্টি করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় বাংলার গভর্ণর, গভণ৪র জেনারেহল পদে আসীন হবেন। চারজন সদস্যবিশিষ্ট গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল গঠিত হয়। এই আইনেই গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের নাম এবং কাউন্সিল সদস্য হিসাবে ক্লাভারিং, মনসন্, বারওয়েন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিকের নাম ঘোষিত হয়। গভর্ণর জেনারেলের শাসনকালের মেয়াদ হয় পাঁচ বছর। বলা হয় গভণ৪র জেনারেল কলাকাত থেকে কোম্পানির বম্বে ও মাদ্রাজ কুঠির পের কর্তৃত্ব খাটাবেন। বস্তুত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানীতে পরিণত হয়। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং কোম্পানির বিষয়ে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব জাহিরের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

৩৮.৩ পিটের ভারত আইন (১৭৮৪)

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই রেগুলিটিং অ্যাক্টের ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই আইনের ফলে কোম্পানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়নি। আবার কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর পরিচালকমণ্ডলীর (Court of Directors) কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। একইভাবে কাউন্সিলের ওপর গভর্ণর জেনারেলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বম্বে ও মাদ্রাজ কাউন্সিলের ওপর বাংলার কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টিও অস্পষ্ট থেকে গিয়েছিল। তার ওপর কতকগুলি বিষয় পরিস্থিতি জটিল করে তুলেছিল। কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ, কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম কোর্টের বিরোধ, প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ও অন্যান্য যুদ্ধের জন্য ইংরেজ কোম্পানির বিপুল অর্থব্যয় কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তথা ইংরেজ সরকারকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই অবস্থায় লর্ড নর্থ কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সংস্ক ও বার্ক এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় এই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। ১৭৮১ সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হলেও তা বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। সমস্যাগুলি থেকেই গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী হন পিট। ১৭৮৪ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত ভারত আইন জারী করেন। এই আইন পিটের ভারত আইন (Pitt's India Act) নামে পরিচিত।

১৭৮৪ সালের পিটের ভারত আইন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করেছিল। ১৭৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতবর্ষে এই আইন কার্যকর করা হয়। এই আইন অনুযায়ী একটি বোর্ড অফ কন্ট্রোল (Board of Control) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয়—ভারত সচিব (Secretary of State), অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer), চারজন প্রিভি কাউন্সিলার—এই ছয়জন কমিশনারকে নিয়ে বোর্ড অফ কন্ট্রোল গঠিত হবে। এই বোর্ডকে কোম্পানি কর্তৃক সামরিক ও অসামরিক শাসনকার্য পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়গুলি দেখাশোনা ও নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। বলা হয়—বোর্ড অফ কন্ট্রোল ইচ্ছেমত কোম্পানির কাগজপত্র দেখতে পারবে এবং কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ ভারতের সামরিক, প্রশাসনিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ইংরেজ কুঠির গভর্ণরদের ক্ষেত্রে কলকাতার গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ মানা যে বাধ্যতামূলক এ বিষয়ে রেগুলেটিং অ্যাক্টে কোন নির্দিষ্ট আইন ছিল না। পিটের ভারত আইন এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে এবং বলে যে, ভারতে কর্মরত কোম্পানির যেকোন স্তরের প্রশাসনিক কর্তাই গভর্ণর জেনারেলের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩৮.৪ বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ইংরেজ ইষ্ট কোম্পানির পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার রাজনীতিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৬৫ সালে বাংলার দেওয়ানি লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি অনেকটাই বাড়িয়ে নিয়েছিল। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর ইংরেজ কোম্পানি

বাংলাদেশে আর দ্বৈত শাসনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চায়নি। তারা সরাসরি বাংলাদেশের সামগ্রিক শাসনব্যবস্থা নিজেদের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিল। ১৭৭২ সালে ইংরেজ কোম্পানি সরাসরি বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলাদেশে কোম্পানির গভর্ণর হয়ে আসেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী হেস্টিংস হন গভণ৪র জেনারেল। হেস্টিংস দেখেছিলেন যে, তৎকালীন বাংলাদেশে কোন সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত বিচারব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না। বাংলাদেশে কোমপানির শাসনকে একটি স্থায়ী ও সুদৃঢ় রূপ দেবার জন্য বিচার বিভাগীয় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। বিচার সংক্রান্ত শাসনব্যবস্থাকে একটি চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

৩৮.৪.১ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

১৭৭২ সালে ভ্রাম্যমান কমিটির (Committee of Circuit) সুপারিশ অনুসারে বাংলার প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত ও একটি করে ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়। কলকাতায় দু'টি উচ্চ আদালত গঠিত হয়েছিল। দেওয়ানি মামলার বিচারের জন্য সদল দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারী মামলার নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামৎ আদালত কলকাতায় তৈরি হয়েছিল। এই দুটি আদালতই ছিল আপীল আদালত। জেলার দেওয়ানি আদালতগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কালেক্টর। সদর দেওয়ানি আদালেতের মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা করতনে কাউন্সিলের সদস্যরা। সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রেসিডেন্ট। ফৌজদারী আদালতগুলি ভারতীয় বিচারকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ভারতীয় বিচারকেরা প্রচলিত রীতিনীতি ও নজীরের ওপর ভিত্তি করে ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তবে প্রয়োজনে জেলা ফৌজদারী আদালতগুলির বিষয়ে কালেক্টর এবং সদর নিজামৎ আদালতের বিষয়ে কাউন্সিল সদস্যরা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন।

১৭৭৪ সালে জেলা দেওয়ানি আদালতগুলি পরিচালনার জন্য 'আমিল' নামে একদল ভারতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমিলের বিচারে অসন্তুষ্ট হলে, যে কোন পক্ষই প্রাদেশিক কাউন্সিলে (Provincial Council) আবেদন করতে পারত। সেখানেও যদি কোন মামলার সঠিক নিশ্পত্তি না হত তবে সদল দেওয়ানি আদালতে আপীল করা যেত। ১৭৭৫ সালে সদর নিজামৎ আদালতকে কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ স্থানান্তরিত করা হয়। নায়েব নাজিম নামক ভারতীয় পদাধিকারীর ওপর সদর নিজামৎ আদালতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অপরাধমূলক মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

১৭৮০ সালে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিলের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানি আদালতের হাতে অর্পিত হয়। কোম্পানির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের এই দেওয়ানি আদালতগুলির সভাপতিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৭৮১ সালে দেওয়ানি আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ করা হয়। এই দেওয়ানি আদালতগুলির মধ্যে ৪টিতে কালেক্টরেরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। অবশিষ্ট ১৪টিতে ইউরোপীয় বিচারকেরা বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। উচ্চতর আপীলের জন্য সদর দেওয়ানি আদালতে যেতে হত। জেলা আদালতের বিচারকেরা ক্রমে ফৌজদারী মামলার বিষয়েও ফৌজদারদের পরিবর্তে

দেখাশোনা করতে আরম্ভ করেন। তবে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে নায়েব নাজিম তখনও চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ উপভোগ করতেন। দেওয়ানি বিচারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে একটি হিন্দু আইনবিধি ও একটি মুসলিম আইনবিধি সঙ্কলিত হয়। এই আনিবিধি দুটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ইতিমধ্যে রেগুলেটিং অ্যাক্টের সুপারিশ অনুসারে ১৭৭৪ সালে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট তৈরি হয়েছিল। এই সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন বিচারপতি নিযুক্ত করা হয়। ইংল্যান্ডের রানী এই আদালত তৈরি করেছিলেন। বলা হয়েছিল যে, সুপ্রীম কোর্ট কেবলমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকদের বিচার করবে। কিন্তু এই আদালত তৈরি হবার ফলে বেশ কিছু বাস্তব অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। সুপ্রীম কোর্ট সবার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করে। এই আদালত প্রায়ই কোম্পানির তৈরি করা আদালতগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে উক্ত আদালতগুলির বিচারক ও কর্মচারীদের বিচারের দায়িত্ব নিয়ে নিত। সুপ্রীম কোর্ট যে সমস্ত আইনী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করত, তা ছিল ভারতীয়দের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী। ফলে সুপ্রীম কোর্টের কাজকর্ম বাংলার জনমানসে ক্ষোভ ও বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল—"এই আদালত ভারতীয়দের কাছে ভীতিজনক হয়ে উঠেছে এবং কোম্পানির সরকারকে অসুবিধায় ফেলেছে" (The Court has been generally terrible to the natives and had distracted the government of the Company.)।

১৭৮০ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করেন। ইম্পেকে মোটা টাকার বেতনে বহাল করা হয়। কিন্তু এই কাজের জন্য হেস্টিংস কঠোরভাবে সমালোচিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি ইম্পেকে উৎকোট প্রদান করেছেন। বস্তুত এক বিশাল পরিমাণ বেতনের বিনিময়ে এলিজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানি আদালতের সভাপতি নিযুক্ত করা ছিল উৎকোচ প্রদানেরই নামান্তর। লন্ডনে কোম্পানির কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ এবং হাউস অফ কমন্স সরকারের কাছে ইম্পেকে দেশে ফিরিয়ে আনায় দাবী তোলে। ১৭৮২ সালে ইম্পে ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে এবং তাঁর সমস্ত বেতন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে ১৭৮১ সালের একটি আইনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট ও কাউন্সিলের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা হয়। বলা হয় রাজস্ব সংক্রান্ত কোন মামলা সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে থাকবে না। গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের কোন বিষয়ে সুপ্রীম কার্টে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কলকাতার সমস্ত অধিবাসীদের ওপর সুপ্রীম কোর্টের বিচার ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া হয়। ১৭৮২ সালে এলিজা ইম্পে ভারত ত্যাগ করার পর গভণ৪র জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল সদর দেওয়ানি আদালতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

৩৮.৪.২ কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পর অল্প কিছুদিনের জন্য গভণ৪র জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ম্যাকফার্সন। তারপর ১৭৮৬ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল হয়ে বাংলায় আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। কর্ণওয়ালিসের আমলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিভাগীয় সংস্কার সাধিত হয়েছিল। ১৭৮৭ সালে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ ছাড়া সমস্ত জেলা আদালতগুলিকে

পুনরায় কালেক্টরের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা হল। কালেক্টরদের হাতে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হল এবং তাঁরা সীমিত ভাবে ফৌজদারী মামলা পরিচালনার অধিকারী ছিলেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারী মামলার বিচার তখনও জেলা ফৌজদারী আদালতগুলিকে এবং সদর নিজামৎ আদালতেই হত। কালেক্টররা রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারতেন না। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিলে রাজস্ব পরিষদের (Board of Revenue) ওপর।

১৭৯০ সালে এই ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে রাজস্ব পরিষদ বিশেষ সাফল্যলাভ করেনি। তখন রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তির জন্য কালেক্টরের অধীনে একটি করে স্থানীয় আদালত গঠিত হয়েছিল। ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল আরও সুদূরপ্রসারী। সদর নিজামৎ আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে পুনরায় কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। একজন মুসলমান বিচারকের পরিবর্তে গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিল এই আদালতে সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞরা তাঁদের সাহায্য করতেন। জেলা ফৌজদারী আদালতগুলি তুলে দেওয়া হয়। তার পরিবর্তে কলকাতা, ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদে চারটি ভ্রাম্যমান আদালত গঠিত হয়। কোম্পানির দু'জন উচ্চপদস্থ কম৪চারী ভারতীয় আইন বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই আদালতগুলির মামলা পরিচালনা করতেন। এই বিচারকদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় তাদের বছরে দুবার ভ্রমণ করতে হত। কালেক্টরদের হাতে বিচারেকর ক্ষমতা (Magistrate's Power) বৃদ্ধি করা হয়েছিল। কালেক্টরেরা চারটি প্রাদেশিক ফৌজদারী বিচারালয়ের রায় অনুযায়ী অপরাধীদের শাস্তি দেবার দায়িত্ব নিতেন।

১৭৯৩ সালের মে মাসে বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালিস কোড' প্রণীত হয়। এই আইনবিধিতে আইনী পরিবর্তনগুলিকে বিশ্লেষণ করে আরও কিছু নতুন আইনের সূচনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে "বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালিস কোড' ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ইস্পাত কাঠামো তৈরি করেছিল' (The famous Corwallis Code formed the steel frame of British-Indian administration)। এই সময় মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় নীতি নির্ধারিত হয়েছিল। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল কালেক্টরদের হাত থেকে বহুমুখী দায়িত্ব হ্রাস করা। বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব হাতে পেয়ে কালেক্টরেরা অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিল। কালেক্টররা জেলাগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। ফলে কালেক্টরদের হাত থেকে বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। পরিবর্তে জজ্ (Judge) নামে একদল নতুন অফিসারকে বিচারক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। জেলার রাজস্ব আদালতগুলি এবং বোর্ড অফ রেভেনিউ বা রাজস্ব পরিষদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হল। এখন থেকে জজেরাই দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি করার অধিকার পেলেন। পাটনা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে তিনটি নগর আদালত এবং ২৩টি জেলা আদালতের বাইরেও অনেকগুলি নিম্ন আদালত (Lower Courts) গঠিত হল। সর্বনিম্ন আদালত ছিল মুনসিফের আদালত। সেখানে ৫০ টাকা পর্যন্ত মামলা চলত। তার ঠিক ওপরের স্তরে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত। এইসব আদালতের রায়ে কেউ সন্তুষ্ট না হলে সে জেলা আদালতে আপীল করতে পারত।

কর্ণওয়ালিসের বিচার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—শাসনতন্ত্র পরিচালনার

ক্ষেত্রে ভারতীয়দের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। তিনি আগেই ভারতীয়দের হাত থেকে ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। নিজস্ব এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে জমিদারেরা যে ক্ষমতা উপভোগ করতেন—কর্ণওয়ালিস এবার তা বতিল করলেন। জমিদারেরা নিজস্ব পুলিশ বাহিনী বাতিল করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যেক জেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দারোগা নামে একদল কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। দারোগা ছিল সরাসরি সরকারি কর্মচারী। দারোগারা নির্ধারিত এলাকায় ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে কাজ করত।

এইভাবে কর্ণওয়ালিস প্রত্যেক জেলার শাসনতন্ত্র দু'জন ইউরোপীয় অফিসারের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। একজন ছিলেন কালেক্টর। তাঁর দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। অন্যজন ছিলেন একাধারে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাজ ছিল বিচারকের দায়িত্ব পালন করা ও এলাকার অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমন করা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতান্ত্রিক পদগুলি থেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই ভারতীয়দের অপসারিত করেছিলেন কর্ণওয়ালিস।

৩৮.৫ ভূমিরাজস্ব নীতি

বাংলাদেশে ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পরই তাদের মনোনীত নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খানকে নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত করে তার ওপর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব অর্পম করে। ১৭৬৫ সালের পর থেকে ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় করা। নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হয়েই রেজা খান বুঝে যান যে তাঁর অস্তিত্ব নির্ভর করছে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করার দক্ষতার ওপর। সেই সময় ভূমিপরাজস্ব আদায়ের জন্য আমিলদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি মনোনীত নায়েব দেওয়ানের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছিল। আমিলদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকের ওপর চরম উৎপীড়ন চালিয়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও নায়েব দেওয়ান তথা ইংরেজ কোম্পানিকে সন্তুষ্ট রাখা। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে উৎপাদন অনুপাতে ভূমিরাজস্ব আদায়ের হার এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কৃষিক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সঙ্কট দেখা দিল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ কোম্পানির তৎকালীন গভর্ণর ভেরেলেস্ট ১৭৬৯ সালে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সুপারভাইজার নামে একদল কোম্পানির কর্মচারী নিয়োগ করেন। আমিলদারী ব্যবস্থার অবসান ঘটে। নবনিযুক্ত সুপারভাইজারদের নিজ নিজ জেলাগুলির আর্থিক অবস্থা ও সেখানের অধিবাসীদের রাজস্ব দেবার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়। এই কর্মচারীদের রায়তরা বিভিন্ন জেলায় কি ধরনের অধিকার উপভোগ করনে এবং তাদের কাছ থেকে কি হারে রাজস্ব দাবী করা হয়, সে সম্পর্কেও একটি তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। নায়েব দেওয়ানের মত সুপারভাইজররাও মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছে দায়বন্ধ ছিলেন। ১৭৭০ সালের মধ্যেই সুপাইভাইজারী প্রথা একটি অদক্ষ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কারণ প্রত্যেক

সুপারভাইজারই তাঁর জেলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর তার একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৭৭০ সালের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুটি "রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ" (Comptrolling Council of Revenue) গঠিত হয়।

৩৮.৫.১ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও তারপর

নায়েব দেওয়ান রেজা খানের আমলে আমিলদারী ব্যবস্থা বাংলার কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছিল। কৃষকদের করভারে জর্জরিত করে চরম উৎপীড়ন চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত। এর সঙ্গে যুক্ত হল অজন্মা। ১৭৬৮ ও ১৭৬৯ সালে অনাবৃষ্টির জন্য ফসল উৎপাদন বিঘ্নিত হল। মারাত্মক হারে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং বণিক ও সুপারভাইজারের গোমস্তাদের কালোবাজারী মানুষের দুর্দশার মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল। এইসব ঘটনার অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই ১৭৭০ সালে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। মন্বন্তরের পরেই এলো এক সর্বগ্রাসী মহামারী। পূর্ণিয়া, নদীয়া, বীরভূম, রাজশাহী, বর্ধমানের একাংশ, রাজমহল, ভাগলপুর, হুগলী, যশোর, মালদা ও চব্বিশ পরগণা ছিল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা। ১৭৭০ সালের মে মাসে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী বলেছিল—বাংলার সমগ্র জনসংখ্যা $^{১}/_{৩}$ অংশ মানুষের জীবনহানি ঘটেছিল এই মন্বন্তরের ফরে। ১৭৭২ সালে বাংলার বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন—সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এবং কৃষিজীবী মানুষের অর্ধেক এই দুর্ভিক্ষের ফরে মরাা গেলেও কোম্পানি সরকার ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি মেনে নেয়নি।

১৭৬৫-৬৬ সাল থেকে ১৭৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত কোম্পানি সরকারের রাজস্ব আদায় ৫৩.৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হেস্টিংসের সরকার ১৭৭৩ সালে স্বীকার করেছিল যে, সরকার রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল বলেই এতবড় দুর্ভিক্ষের পরও আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পায়নি। হান্টার লিখেছেন—"এমন কি ৫ শতাংশও ভূমিরাজস্বের হারে ছাড় দেওয়া হয়নি এবং পরের বছরের জন্য তা ১০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। ত্রাণব্যবস্থা ছিল অমানবিক রকমের অপর্যাপ্ত" (Not even 5 percent of the land revenue was remitted and 10 percent was added to it next year. The relief measures were inhumanly inadequate.)। কুখ্যাত "নাজাই" বন্দোবস্ত রাজস্ব ক্ষেত্রে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণের নগ্নতম রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। এই ব্যবস্থায় বলা হয়েছিল—জেলাগুলির নিকৃষ্ট ও অনুর্বর অঞ্চলে যারা বসবাস করছে তাদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হবে, কারণ তাদের মৃত বা পলাতক প্রতিবেশীদের জন্য রাজস্বের যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা তাদেরই পূরণ করতে হবে। কোম্পানির বর্ধিত রাজস্ব চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষকেরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়াতে মনযোগী হল। তাছাড়া দুর্ভিক্ষের পরই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবার ফলে কৃষিপণ্যের মূল্য কমতে থাকে। একদিকে অতিরিক্ত উৎঋপাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং অন্যদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। কৃষিপণ্য বিক্রি করে সঠিক দাম না পাও ?ার জন্য কৃষকরা সরকারের রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়। এই অবস্থায় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বালার ভূ

মিরাজস্ব ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ও রাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বাড়ানোর জন্য নতুন ভাবনাচিন্তা শুরু করেন।

৩৮.৫.২ ওয়ারেন হেস্টিংসের ইজারাদারী বন্দোবস্ত ও তার পরিণতি

১৭৭২ সালের এপ্রিল মাসে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানিকে সরাসরি গ্রহণ করার নির্দেশ পাঠায়। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানির ভারতীয় কর্তৃপক্ষ নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খানকে এবং বিহারের দেওয়ান সিতাব রাইকে বিতাড়িত করেন। রাজস্ব নিয়ামক পরিষদ তুলে দেওয়া হয় এবং সুপারভাইজাররা কালেক্টর হিসাবে পরিচিত হন। ভূমিরাজস্ব বিষয়ে নজরদারী করার জন্য ১৭৭২ সালে একটি ভ্রাম্যমান কমিটি (Committee of Circuit) গঠিত হয়। ১৭৭৩ সালে কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বর্ধমান ও ঢাকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Council) গঠিত হয়।

এই ব্যবস্থা অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারদের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব তুলে দেবার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বাংলার বহু এলাকায় পুরনো জমিদারদের বাতিল করা হয়। পরিবর্তে সর্বোচ্চ নিলামদারকে ইজারাদার হিসাবে বসানো হয়। যে সব এলাকায় জমিদারেরাই সর্বোচ্চ নিলামদার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সব জায়গায় অবশ্য জমিদাররাই পাঁচ বছরের জন্য ইজারাদারী লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থার অন্যতম বড় ত্রুটি ছিল যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার্যকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। অধিকাংশ নিলামদারই ছিল কলকাতা শহরের লোক এবং গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে তারা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ। জমির ইজারাদারী লাভের আশায় তারা কোন কিছু চিন্তা না করেই দেয় রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ নিলাম হিসাবে হেঁকে দিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক ইজারাদারই রাজস্বের প্রথম কিস্তির টাকা সরকারকে দিতে পারেনি। কোন কোন জমিদরা বাংলার ভূমিব্যবস্থায় বানিয়াদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার তাগিদে উচ্চতর নিলাম হেঁকে নিজস্ব জমিদারী বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তারাও তাদের প্রতিশ্রুত রাজস্ব কোম্পানি সরকারকে দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে ভূমিরাজস্ব খাতে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেল না।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে হেস্টিংসের ব্যর্থতা সূচিত করেছিল। হেস্টিংসের নতুন ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পাট্টা ব্যবস্থা সুদক্ষভাবে কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু নতুন পাট্টা দেওয়ার সময় প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার ব্যাপারে কারও কোন উৎসাহ ছিল না সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই পাট্টা নথিভুক্ত হত না। ঐতিহাসিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—অনেক সময়ই এর সুযোগ নিয়ে রায়তরা তাদের কৃষিজমির এলাকা বাড়িয়ে নিত বা খাজনার পরিমাণ কমিয়ে নিত। অপেক্ষাকৃত ধনী রায়তরা প্রায়ই ইজারাদারকে উৎকোচ দিয়ে নিজস্ব দেয় খাজনার হারে ছাড় নিয়ে নিত। ফলে দরিদ্র রায়তদের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানো হত। খাজনার ন্যায্য ও সঠিক হারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। হেস্টিংসের নয়া বন্দোবস্তের মারাত্মক কুফল হিসাবে বাংলার গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ইজারাদারী ব্যবস্থা বেনিয়াদের জমির সঙ্গো তাদের স্বার্থ জড়িত করার সুযোগ উন্মুক্ত করেছিল। বেনিয়াদের সঙ্গো হাত মিলিয়ে ছিল তাদের ইংরেজ প্রভুরা। ১৭৭৩ সালে "পার্লামেন্টারি কমিটি অফ সিক্রেসী" তার প্রতিবেদনে লিখেছিল—কোম্পানি কর্মচারীরা প্রায়ই বেনিয়াদের সঙ্গো জমির খাজনা থেকে আসা লাভ ভাগ করে নিচ্ছে। ১৭৭৫ সালে ফিলিপ ফ্রান্সিস অভিযোগ করেন যে, গ্রামাঞ্চলে ইংরেজ কর্মচারী ও বেনিয়াদের মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছে এবং তার ফলে কোম্পানির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ১৭৭৬ সালে কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী স্বীকার করে যে, গ্রামবাংলার ভূমিব্যবস্থায় তথা রাজস্ব ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক গোষ্ঠী স্বার্থের উল্লেখযোগ্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ইজারাদারী ব্যবস্থার ব্যর্থতার কথা বুঝতে পেরে হেস্টিংস ১৭৭৭ সালের এপ্রিল মাসে ইজারাদারদের বাতিল করে জমিদারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রতিটি জেলার রাজস্ব দেবার ক্ষমতা মূল্যায়ন করার জন্য ১৭৭৬ সালে আমিনী কমিশন বসানো হয়। তাছাড়া ল+ডনের পরিচালকমন্ডলী নির্দেশ পাঠায় যে, ইংরেজ কোম্পানিকে রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গো একটি বার্ষিক চুক্তি করতে হবে। তাই করা হল। রাজস্ব বিষয়ে জমিদারদের সঙ্গো কোম্পানির এক বছরের চুক্তি হত বলে এই ব্যবস্থাকে বলা হত একসালা বন্দোবস্ত।

এই নতুন ব্যবস্থা অনুসারে সিদ্ধান্ত হয় যে জমিদারের সঙ্গো কোম্পানির চুক্তি হবে শেষ কথা। অন্য কেউ যদি জমিদারের থেকে বেশি রাজস্ব দেবার প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রাহ্য হবে না। কিন্তু রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে আগের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিই বহাল রাখা হল। ইজারাদারী ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের সময় জমির উৎপাদিকা শক্তি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের খাজনা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা না করেই নিলাম ডেকে ভূমিরাজস্ব স্থির করা হয়েছিল। নতুন ব্যবস্থাতেও ঐ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বিগত তিন বছরে সরকারি কোষাগার যে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়েছিল তার নীট গড় বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ হিসাবে জমিদারদের ওপর ধার্য করা হয়। যেহেতু ইজারাদারী ব্যবস্থার রাজস্ব নির্ধারণের ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এ ক্ষেত্রেও বহাল রাখা হয়েছিল, সেহেতু মানুষের ওপর অতিরিক্ত খাজনার বোঝা চাপানোর প্রবণতা থেকে গেল। বহু জমিদারই নির্ধারিত রাজস্ব দিতে পারলেন না। ফলে তাদের জমির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কোম্পানি সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ রাজস্ব জমা দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারেরা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁরা রায়তদের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করতে থাকেন। দরিদ্র রায়তদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভূমিরাজস্ব নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের দ্বিতীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

এই অবস্থায় হেস্টিংস একটি কেন্দ্রীভূত রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৭৮১ সালে প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলি বাতিল করে একটি "রাজস্ব কমিটি" (Committee of Revenue) গঠিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় বাড়ল না। রাজস্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন কমিটির অন্যতম সদস্য স্যার জন শোর। রাজস্ব ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য শোর জেলা স্তরে একজন করে ইউরোপীয় কালেক্টর রাখার কথা বলেন। হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতি বাংলার রায়তদের

খাজনার ভারে জর্জরিত করেছিল। ফলে গ্রামীণ সমাজে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিংসাত্মক ঘটনার বৃদ্ধি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তুলেছিলষ অভিজ্ঞতা থেকে কোম্পানি কর্তৃপক্ষক্ষ উপলব্ধি করে যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার তাগিদে বাংলার জমিদারদের সঙ্গো সুসম্পর্ক স্থাপন করা দরকার এবং এর অত্যাবশ্যক শর্ত ছিল জমিদারদের আদিম ও ঐতিহ্যগত অধিকারগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর জেনারেল হয়ে ১৭৮৬ সালে কলকাতায় আসেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।

৩৮.৫.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট

ফরাসি ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যতম কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্র কেবলমাত্র ভূমির ওপর কর দাবী করতে পারে। ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে বাংলার জমিদারদের সঙ্গো ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তোলার স্বপক্ষে তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—জমির প্রকৃত মালিক জমিদারেরা, ফলে সরকারের সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজন নেই। জমিদারেরা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তার একাংশ সরকারি কোষাগারে জমা দেবেন। পাট্টচার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছিল যে, এটা হবে জমিদার ও তাঁর প্রজাদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক একটা চুক্তি। জমিদার ও প্রজারার প্রাস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই চুক্তিতে আবন্ধ হবেন। প্রথম থেকেই ফ্রান্সিসের বক্তব্য ছিল—অতিরিক্তি মাত্রায় রাজস্বের বোঝা না চাপিয়ে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তিগ্রাহ্য একটি রাজস্বের হার ধার্য করা উচিত। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের উদদে্শ্যে চিল যত বেশি সম্ভব ভূীমিরাজস্ব খাতে সরাকরি আয় বৃদ্ধি করা। পিটের ভারত আইনে (১৭৮৪) জমিদারদের ক্ষোভের কারণগুলি অনুসন্ধান করে সেগুলিকে প্রশমিত করতে ও রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গো চুক্তি সংক্রান্ত চিরস্থায়ী আইন প্রণয়ন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

১৭৮৬ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত নানা ধরনের অনুসন্ধান চালানোর পর এখন ১৭৮৪-এর পিটের ভারত ানের ির্দেশ মাথায় রেখে কর্ণওয়ালিস ১৭৮৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে জমিদারদের সঙ্গো একটি দশসালা বন্দোবস্ত গড়ে তোলেন। বলা হয়—এই পরিকল্পনা দশ বছরের জন্য গৃহীত হবে। পরবর্তীকালে লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-এর অনুমোদন সাপেক্ষে এই বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী রূপ দেওয়া হবেহ। কিন্তু জন শোর কর্ণওয়ালিসের প্রিস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন—এই বন্দোবস্ত দশ বছর বহাল রাখার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু দশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এই বন্দোবস্ত অপরিবর্তিত থাকবে, এখনই এরকম প্রস্তাব নেওয়া ঠিক নয়। জেমস্ গ্র্যান্ট বাংলায় রাজস্বের হার কম ধার্য করা হয়েছে এই যুক্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবসত্রে বিরোধিতা করেছিলেন। গ্র্যান্ডের এই যুক্তি অবশ্য জন শোর গ্রহণ করেননি। জন শোর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন যে—এই বিষয়ে চট্জলদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অর্থ ভূমিব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধাকে জিইয়ে রাখা। তাঁর বক্তব্য ছিল ধীরে ধীরে ক্রমিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা উচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার প্রাক্-মুহূর্ত শোর মন্তব্য করেছিলেন—বহু পুরনো জমিদার তাঁদের

অক্ষমতা ও অলসতার জন্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। শোরের এই বক্তব্যের উত্তরে কর্ণওয়ালিস বলেছিলেন—অলস জমিদারদের অদক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি যদি অধিকতর পরিশ্রম ও উদ্যোগী মানুষের হাতে যায়, তবে তা রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে।

কর্ণওয়ালিস জন শোরের প্রস্তাব গ্রহণ না করে নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এগোতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি ভারত সচিব হেনরী ডান্‌ডাসের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করা বা একটি বাস্তবসম্মত বন্দোবস্ত গড়ে তোলা—এর কোনটিই ডান্‌ডাসের বিবেচনাধীন ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করা ও ভূ মিরাজস্ব খাতে কোম্‌পানি সরাকরের আয় বৃদ্ধি করা। ১৭৯২-এর ২৯শে অগাস্ট কর্ণওয়ালিসের পরিকল্পনা লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ বা পরিচালকমন্ডলীর অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩ সালে এই অনুমোদন পত্র কর্ণওয়ালিসের হাতে এসে পৌঁছায়, অর্থাৎ ১৭৮৯ সালের দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করার নির্দেশ পাঠানো হয়। ১৭৯৩-এর ২২শে মার্চ কর্ণওয়ালিস বাংলার জমিদারদের সঙ্গে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (Permanent Settlement) ঘোষণা করেন।

৩৮.৫.৪ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও বাংলার ইতিহাসে তার প্রভাব

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাংলাদেশে নীট রাজস্বের পরিমাণ সাব্যস্ত হল ২৬,৮০০,৯৮৯ টাকা। বলা হল—জমির ওপর জমিদারদের বংশানুক্রমিক ও হস্তান্তরযোগ্য অধিকার কোম্পানি স্বীকার করে নেবে। বিনিময়ে বৎসারন্তে জমিদরার তাঁর ওপর ধার্য রাজস্ব কোম্পানির কোম্পানি সরকারকে মিটিয়ে দেবেন। কোন জমিদার কোম্পানির পাওনা রাজস্ব সময়মত মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হলে, তার জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং নিলামের মাধ্যমে সেই জমিদারী অন্য জমিদারের কাছে বিক্রি করা হবে। রাজস্বের হার নির্ধারণ নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। বারবার রাজস্বের হার নির্ধারণের সমস্যা এড়ানোর জন্য কর্ণওয়ালিস সুপারিশ করেন—১৭৮৯-৯০ সালে জমিদারেরা তাদের প্রজাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ খাজনা আদায় করেছিলেন, তার নয়-দশমাংস থাঁরা সরকারকে রাজস্ব হিসাবে দেবেন। এই রাজস্বকে চিরস্থায়ী রাজস্ব হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। পরবর্তীকালে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পেলেও রাজস্বের এই পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে এবং সরকার বর্ধিত রাজস্ব দাবী করবে না। এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংলার ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষিত হাবর পরই লন্ডনের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্ একটি প্রতিবেদনে বলেছিল—উৎপাদনশীল নীতির (Productive Principles) সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল হিসাবে বাংলায় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে এবং সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বৃদ্ধি ঘটবে।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এবং বালংরা গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করেন। প্রথমত, ঔপনিবেশিক শাসকেরা এদেশে একদল রাজনৈতিক মিত্র পাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবেই মনে করেছিলেন যে, জমিদারদের ভূ-সম্পত্তির ওপর পূর্ণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার এবং অপরিবর্তনীয় ও চিরকালীন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করার ফলশ্রুতি হিসাবে জমিদারেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ

রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশরাজকে সমর্থন করবে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম প্রধান সহায়ক স্তম্ভে পরিণত হবে। রাষ্ট্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক স্তর হিসাবে জমিদারেরা বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ কোম্পানিকে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত সমস্যা ১৭৬৫ সাল থেকেই বিব্রত রেখেছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন করে ভূমিরাজস্ব খাতে একটি স্থিতিশীল ও নির্দিষ্ট আয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, কর্ণওয়ালিস সহ বহু ইংরেজই মনে করেছিলেন যে, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে কৃষির উন্নতি ও সম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী। খোদ ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এ ধরনের চিন্তা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। কারণ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডের বহু জমিদার ও বর্ধিষ্ণু চাষীর উদ্যোগে কৃষি উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই ঘটনা "কৃষি বিপ্লব" (Agricultural Revolution) নামে বিখ্যাত। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের অন্যতম পূর্বশর্ত ছিল এই কৃষি বিপ্লব। ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে কর্ণওয়ালিস আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, ভূ-সম্পত্তির ওপর জমিদারদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে নিলে জমিদারেরা বনাঞ্চল ও পতিত জমিগুলিকে কৃষিজমিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেবেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমি অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। কোম্পানির আশা ছিল জমিদারী উদ্যোগ এই অঞ্চলগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করবে। চতুর্থত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের সময় নিয়ম করা হয়েছিল জমিদারকে তার রাজস্ব দেবার নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের আগে কোম্পানির কাছে রাজস্ব জমা দিতে হবে। অপরাগ হলে তাঁর জমি নিলাম করে হস্তান্তরিত হবে। এই আইন সূর্যাস্ত আইন (Sunset Law) নামে পরিচিত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের তরফে আশা করা হয়েছিল জমিদারী পরিচালনায় ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে দক্ষতার ঘাটতি দেখা দিলে অদক্ষ জমিদারের পরিবর্তে দক্ষ জমিদারের মালিকানা জমিতে প্রতিষ্ঠিত হবে। পঞ্চমত, অসংখ্য রায়তের পরিবর্তে মুষ্টিমেয় সংখ্যক জমিদারের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিয়ে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ মনে করেছিল—রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে সরল ও সস্তা প্রক্রিয়া।

বাংলার জমিদারেরা খুশি মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের পরই দেখা গেল যে দীর্ঘদিন ধরে চাল কৃষিপণ্য মূল্যের স্বল্পতা জমিদারদের বেশ অসুবিধায় ফেলেছিল। ১৭৯৪-১৭৯৭ সালের মধ্যে কৃষিপণ্যের দাম বিশেষ বাড়েনি। সর্বাধিক সংখ্যক জমিদারী বিক্রির ঘটনা সম্ভবত এই সময়েই ঘটেছিল। পুরনো জমিদারেরা প্রায়ই কোম্পানির রাজস্ব চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হতেন এবং সঙ্গো সঙ্গো সেই জমিদারী সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নিলাম হত ও অন্য জমিদারের হাতে চলে যেত। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি ও ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা গেল যে বহু প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী জমিদারগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানিকে রাজস্ব জমা দিতে না পেরে হস্তান্তরিত হয়েছিল। এই সব জমিদারীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজশালী নদীয়া, দিনাজপুর, বীরভূ ম, বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী। ঐতিহাসিক সিরাজুল ইসলাম তাই বলেছেন—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গো বৃহৎ জমিদারীগুলির অস্তিত্ব ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গাতিবিহীন। ছোট জমিদারীগুলি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

কোম্পানির তরফ থেকে অবশ্য বড় জমিদারীগুলি ধ্বংস হবার কারণ হিসাবে জমিদারদের অমিতব্যয়িতা ও জমিদারীগুলির অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের সত্যতা আংশিক। নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ মনে করেন—সে সময়ের নিরিখে (১৭৯৩—৯৪) নির্ধারিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি।

প্রাপ্ত ঐতিহাসিক দলিল থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বড় ও ঐতিহ্যশালী জমিদারীগুলিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই ধ্বংস রোধ করার জন্য এবং জমিদারী নিজের হাতে রাখার জন্য বড় জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলনের কিছুদিনের মধ্যেই এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। প্রজাদের কাছ থেকে দ্রুত খাজনা আদায়ের জন্য তাঁরা তাঁদের জমিদারী ভাগ করে দিতেন। এইভাবে বাংলার কৃষিসমাজে এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হল। বড় জমিদাররা যাদের মধ্যে জমিদারী ভাগ করে দিয়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিতেন তাদের বলা হয় মধ্যস্তত্বভোগী জমিদার (Intermediary landlords)। ১৭৯৯ সালে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র সঙ্কট এড়ানোর তাগিদে মধ্যসত্ত্বাধিকারীদের মধ্যে তাঁর জমিদারী ভাগ করে দিয়েছিলেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত পত্তনি ব্যবস্থা। পত্তনি ব্যবস্থার ফলে বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদার ও রায়তের মাঝখানে একাধিক মধ্যবর্তী স্তরের সৃষ্টি হল। জমিদার একজন মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে তাঁর জমিদারীর একাংশ তুলে দিতেন। সেই মধ্যস্বত্বভোগী আবার তাঁর অধীনস্থ বিভিন্ন উপস্বত্বভোগী, যথা—পত্তনিদার, ইজারাদার প্রভৃতির হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তুলে দিতেন। বহু ক্ষেত্রে জমিদারেরা মধ্যস্বত্বাধিকারীদের হাতে রাজস্বপ আদায়ের দায়িত্ব তুলে অর্পণ করে কলকাতায় চলে গিয়ে সেখানে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতেন। ফলে অনুপস্থিত জমিদারের (Absentee Landlord) সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে পুরাতন ঐতিহ্যশালী বহু জমিদারীগুলি হস্তান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু জমিদারী হস্তান্তরের ফলে নতুন জমিদরা হয়ে বসেছিল কারা? অর্থাৎ জমিদারীগুলি কারা কিনেছিল? জেমস মিল এরকম একটি ধারণা সৃষ্টি করেছিলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গো যুক্ত ব্যক্তিরাই জমিদারীগুলি পুরনো জমিদারদের থেকে কিনে নিয়েছিল। এই বক্তব্য সঠিক নয়। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম তথ্য সহকারে দেখিয়েছেন যে—কেবল ব্যবসাদার নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমিদারের আমলা, উকিল ও কর্মচারী এবং পেশাদার মানুষ সুদের কারবারী এরা সকলেই সূর্যাস্ত আইনের শিকার জমিদারীগুলি ক্রয় করে নতুন জমিদার হয়ে বসেছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমির বাজারকে এক ব্যাপকতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবাধীন এলাকাগুলিতে দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছিল—বাজারী অর্থনীতির অনুপ্রবেশ এবং কৃষির বাণিজ্যকরণ। রাজস্ব ও খাজনার অতিরিক্ত বোঝা কৃষির বাণিজ্যকরণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। মাত্রাতিরিক্ত খাজনার ভারে জর্জরিত কৃষকেরা ক্রমেই বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রামীণ মহাজনদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। বর্ধিত খাজনার চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রায়ই

ঋণ নিত। মহাজনেরা নিজেদের পছন্দমত শস্য ফলাতে অধমর্ণ কৃষকদের বাধ্য করেছিল। বর্ধমান ও নদীয়ার চাষীরা নীল, আখ, তুলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল ফলাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তাদের ওপর খাজনার হার আরও বাড়ানো হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল বাংলার রায়তদের। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানি সরকারের সঙ্গে জমিদারদের যেমন চুক্তি হয়েছিল, জমিদারদের সঙ্গে রায়তদের সেরকম কোন চুক্তি হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল যে পরিকল্পনা ফিলিপ ফ্রান্সিস ১৭৭৬ সালে পেশ করেছিলেন তাতে কিন্তু রায়তদের পাট্টা দেবার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় রায়তদের পাট্টা দেওয়া হয়নি বা জমিদার ও রায়তের মধ্যে কোন চুক্তি হয়নি। ফলে জমিদার রায়তদের ওপর খাজনার হার নির্দ্বিধায় বৃদ্ধি করতে পারত। বর্ধিত খাজনার চাপে জর্জরিত রায়তেরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের ওপর চলত নিষ্ঠুর জমিদারী উৎপীড়ন। ১৭৯৯ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংশোধিত আইনের ৭ নম্বর রেগুলেশনে বলা হল—খাজনা দিতে ব্যর্থ রায়তকে জমিদরা ইচ্ছেমত জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারবে। এই আইন রায়তকে তার জমিদারের করুণার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করে তুলেছিল। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন—এই আইন জমিদারদের অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে এই আইন ছিল ব্রিটিশ ভাতরে "প্রথম কালা কানুন"। পত্তনি ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জমিতে যখন বিভিন্ন স্তরের উপস্বত্বভোগী বসল তখন কৃষকদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল।১৮৬০ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বাংলার কৃষকের ওপর মধ্যবর্তী ভূস্বামীদের শোষণ সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছিলেন। নির্ধারিত খাজনার বাইরেও নানা বেআইনী কর এবং আবওয়াব কৃষকদের ওপর বসানো হয়েছিল, যার অনিবার্য পরিণতি ছিল উনিশ শতকের বাংলায় ওএকের পর এক জঙ্গী কৃষক বিদ্রোহ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থে আংশিক সাফল্য এনেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা বাংলার রায়তদের বা সার্বিকভাবে বাংলার কৃষিব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে কর্ণওয়ালিসের দুটি উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছিল। প্রথমত, কোম্পানির সরকার ভূমিরাজস্ব খাতে একটি নির্দিষ্চট পরিমাণ বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, জমিদারদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক মিত্রতা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু "উৎপাদনীশীল নীতি" (Productive Principle) কথাটিকে কর্ণওয়ালিস ও তার সহযোগীরা ১৭৯৩ সালের আগে ব্যাপক প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উৎপাদনশীল নীতির পরিপন্থী হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেককেরেই আশা ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় কৃষি বিপ্লব নিয়ে আসবে। কিন্তু তা আসেনি। উনিশ শতকে বাংলার জমিদারদের আয় বেড়েছিল মূলত রায়তের ওপর চাপানো বর্ধিত খাজনার জন্য। কৃষির উন্নতির ফলে জমিদারের আয় বৃদ্ধি পায়নি। কৃষি থেকে আসা আয় জমিদারেরা বিলাস-বৈভব বা দান-খয়রাতিতে ব্যয় করতে ; সেই আয় কৃষি বা শিল্পের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়নি। জমিদারদের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঙ্গালজনক হয়েছিল।

একদিকে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন ব্যাপারে বাংলার জমিদারেরা ব্রিটিশ রাজশক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। এই অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাই ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত একত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির দ্বারা বাংলার জমিদারদের আচ্ছন্ন করেছিল।

৩৮.৬ সারাংশ

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার দেওয়ানি লাভ বাংলাদেশে কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল। দ্বৈত শাসনব্যবস্থার যুগে বাংলার নবাবের অস্তিত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) বাংলার অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। ১৭৭২ সালে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ সরাসরি বাংলার শাসনভার গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঔপনেবিশক রাষ্ট্রকাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩) এবং পিটের ভারত আইন (১৭৮৪) পাশ হয়। এই আইনগুলির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে কোম্পানির শাসনক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত করা এবং বম্বে ও মাদ্রাজে কোম্পানির কুঠির ওপর বাংলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বিচার-সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত 'কর্ণওয়ালিস কোড' (১৭৯৩) ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থাকে অনেকটাই পরিণত রূপ দিতে পেরেছিল। একইভাবে রাজস্ব শাসনের ক্ষেত্রেও হেস্টিংস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কোম্পানির রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল যেভাবে হোক্ রাজস্ব খাতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের আয় বাড়ানো। ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে কোম্পানির সংস্কার পরিণতি লাভ করেছিল কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মধ্যে। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি কোম্পানির স্বার্থ কোমাপনি কর্তৃপক্ষকে জমিদারদের সঙ্গো ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে একটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল।

৩৮.৭ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর।

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমিরাজস্ব নীতির ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার গ্রামীণ সমাজের ওপর কি প্রভাব ফেলেছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

৪। রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও পিটের ভারত আইনের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

৫। বাংলার কৃষির ওপর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রভাব আলোচনা কর।

৬। বাংলার ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেন প্রবর্তিত হয়েছিল ?

বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন :

৭। কোন্ আইনের দ্বারা গভর্ণর জেনারেল পদটি সৃষ্টি হয় ?

৮। কোন্ আইনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সচিব পদটি সৃষ্টি হয় ?

৯। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কি কমিশন কত সালে বসানো হয় ?

১০। সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন ?

১১। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের সময় কার সঙ্গো কর্ণওয়ালিসের মত বিরোধ হয় ?

৩৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

1. Percival Spear : *The Oxford History of Modern India,* Delhi, 1965.
2. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhury and K. K. Datta : *An Advanced History of India,* London, 1985.
3. A. C. Banerjee : *Constitutional History of India,* Calcutta, 1963.
4. B. H. Baden Powell : *The Land Systems of British India,* Oxfold, 1982.
5. N. K. Sinha : *The Economic History of Hengal* (3 Vols.), 1956—63.
6. ——— (Ed.), *The History of Bengal* (1757—1905). Calcutta, 1967.
7. Sirajul Islam : *The Permanent Settlement of Bengal : A study of its Operations,* Dhaka, 1979.
8. Ranajit Guha : *Towards a Rule of Property for Bengal,* Hague, 1967.
9. S. C. Gupta : *Agrarian Relations and Early British Rule in India,* Bombay, 1963.
10. Suranjan Chatterjee and Siddhartha Guha Ray : *History of Modern India,* Calcutta, 1997.
11. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি,* কলকাতা, ১৩৯৬ (বঙ্গাব্দ)।
12. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় : *বাংলার আর্থিক ইতিহাস : অষ্টাদশ শতাব্দী,* কলকাতা, ১৯৮৫।
13. সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় : *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৯৯৬।